আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নারীর অবস্থান

চিররঞ্জন সরকার

ভূমিকা

আমাদের দেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো সাঁওতালরাও ভীষণরকম আগ্রাসনের শিকার। তাদের ভূমি, ভাষা, সম্পদ এমনকি সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। ভূমি হারানোর ভয়, নারীদের নিরাপত্তাহীনতা, সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সবসময় তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। শিল্পায়ন-শহরায়নের সাথে সাথে তাদের জীবন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, গান সবই হারিয়ে যেতে বসেছে। পুরুষরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেও নারীদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণে তারা মর্যাদাহীন জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে ক্রমশ তারা হয়ে পড়ছে দুর্বল।

বর্তমানে বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হলেও সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাগুলোর প্রায় কোনো উন্নয়নই হয় নি। বরং হারাতে হয়েছে তাদের কৃষিজমি, বন, এমনকি বসতভিটা পর্যন্ত। তাদের অঞ্চলের এই অবকাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে তারা তাদের পেশা পরিবর্তন করতে না-পারায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আয় তারা করতে পারছে না। এর প্রভাব পড়ছে পুরো সমাজব্যবস্থায়। ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কঠিন অসুখেও কবিরাজ বা গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া, সারা বছর পরিবারের কারো-না-কারো অসুখ লেগে থাকা— এসবের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করতে হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন জীবন। এগুলোকে যেন তারা নিয়তি হিসেবেই মেনে নিয়েছে!

দারিদ্র্য, অসচেতনতা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, প্রতিকূল সংস্কৃতি, অধিপতি জনগোষ্ঠীর বিরূপ মনোভাব, নিজের ভাষায় লেখাপড়া বা কথা বলার সুযোগের অভাব, কুসংস্কার, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে অধিকাংশ সাঁওতাল নারী শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন তাদের জীবনে নতুন কিছু, ভালো কিছুর বার্তা কখনোই হাতছানি দিয়ে ডাকে না। আমাদের বৃহত্তর সমাজে নারীর যে চিত্র আমরা পাই, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও সেই একইরকম বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। যারা প্রজন্ম-প্রজন্মান্তর ধরে কর্মঠ, শক্তিশালী, উদ্দাম, সেই সাঁওতাল নারীরাও আজ কত অসহায়! এই অসহায় সাঁওতাল নারীদের সামাজিক পারিবারিক অবস্থা ও অবস্থান নিয়েই এই নিবন্ধ।

কাঠামো ও পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অক্সফামের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৮ সালে 'আদিবাসী সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক : নারীর অবস্থান' বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণার অংশ হিসেবে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়নের মধুমাঠ এবং দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ৭ নম্বর শিবপুর ইউনিয়নের আলুডাঙ্গা গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষদের নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে মোট ৮টি এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন) ও পিআরএ করা হয়। এই ৮টি পিআরএ ও এফজিডিতে ৩৭ জন নারী এবং ২৯ জন পুরুষসহ মোট ৬৬ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও নারীর অবস্থানসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিন ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে খোলামেলা আলোচনা করেন। এই সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে জানা-অজানা অনেক তথ্য। এই নিবন্ধে উল্লিখিত সাঁওতাল নারীর সামাজিক অবস্থানের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়েই সাজানো হয়েছে।

বৃহত্তর সমাজে নারীর অবস্থান

সাঁওতাল নারীদের নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার আগে প্রথমেই আমরা আলোকপাত করব আমাদের বৃহত্তর সমাজ বা মূলধারার নারীদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে।

আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত[১]। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে। এ ধরনের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অধস্তনতা ও কর্তৃত্ব, নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। সমাজপতিরা যেহেতু পুরুষ, তাই সমাজের পদে পদে নিত্যনতুন ব্যবস্থাপনায় তারা নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে

[1] Dr Rounaq Jahan: Engendering Democracy in Bangladesh, Policy Dialogue Series, No. 31, 19 February 2008

নারীও সেই মূল্যবোধ ধারণ করে এবং জীবনাচরণে তার চর্চা করে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্যবিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়।

পুরুষ তার সংসার ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণে তৈরি করেছে বিভিন্ন মূল্যবোধ। মূল্যবোধ তৈরিতে এই প্রয়োজন পূরণই সূচক হিসেবে কাজ করে। নারীশিশুর জন্য খেলনা থেকে শুরু করে তার পোশাক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, চলাফেরার ধরন, কথা বলার ঢং, পেশা সবকিছু সম্পর্কেই মূল্যবোধ তৈরি করা হয় এই প্রয়োজন পূরণকে সামনে রেখে। পিতৃতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে যে মূল্যবোধ তৈরি করা হয়, সেখানে নারী হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং পুরুষ বিনা নারীর গতি নেই। তাই জন্মমাত্রই নিকৃষ্ট ভেবে মেয়েশিশুকে ছুড়ে দেয়া হয় বৈষম্যমূলক অবস্থানে। আবার এই বৈষম্যকে পাকাপোক্ত করতে নারী যাতে তা মেনে নেয়, সেজন্য বৈষম্যের অনুকূলে তৈরি করা হয় মূল্যবোধ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানে নারীর অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় ভাবা হয়, যাতে করে নারী নেতৃত্বপ্রদানে পুরুষের সমান ভাগীদার না-হতে পারে। নারী যাতে কোনোমতেই স্বাবলম্বী হতে না-পারে, সেজন্য নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয় না এবং তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিতে দেয়া হয় না। সেইসঙ্গে নারীরা যাতে সম্পদশালী না-হতে পারে, সেজন্য যতটুকু সম্পত্তি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, ততটুকুও গ্রহণ করা অনুচিত বলে প্রচার করা হয়। নারীর স্বাবলম্বন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো মূল্যবোধ তৈরি করা হয় না। বিরাজমান মূল্যবোধ তাই নারীকে আর্থিক ও মানসিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। ফলে মূল্যবোধের দুষ্টচক্রে পাক খেয়ে নারী আরো অধিকার, মর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে[২]।

তাছাড়া যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে আমরা বসবাস করি এবং যে ভাষা এ সংস্কৃতির মূল, তার সবটাতেই পুরুষের প্রধান্য। নারীকে আড়াল করার জন্য পুরুষের একটি যৌনআগ্রাসী ভাষাও রয়েছে। এমনকি নারী যে সাংস্কৃতিক কাজে ব্যাপৃত হয়, তার মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক, পুরুষের সন্তুষ্টিই তার পরিণতি।

এভাবে অসমতার ভিত্তিতে নিরূপিত সম্পর্কের কারণে নারী হয় বঞ্চিত, নিগৃহীত ও শোষিত। সমাজ নারীর চরিত্রের কিছু ভাবমূর্তি আরোপ করে তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, সংসারে ক্লান্তিহীন শ্রমদানকারী, ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরিপূর্ণ চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করে। গৃহস্থালি ক্রিয়াকর্মে, গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে, উৎপাদনশীলতায় নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। এভাবে ব্যয়িত শ্রম সরাসরি টাকায় রূপান্তরিত হয় না বলেই সাধারণত নারীর শ্রমদানের স্বীকৃতি আসে না। সন্তান জন্মদান ও লালনের মধ্য দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে, তারও যথাযথ স্বীকৃতি নেই। বরং, তার এই অবদান শক্তিতে রূপান্তরিত না-হয়ে দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়[৩]।

তাছাড়া গৃহস্থালি কাজের বাইরে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো নারীকে অন্য কোনো ভূমিকায় দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে নি। প্রথাগত ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত মানুষ নারীকে রাজনীতির মঞ্চে দেখলে হোঁচট খায়। নানাভাবে তার গতিপথ আটকে দিতে চায়। তারপরও যারা এগিয়ে যেতে চায় তাদের নামে নানারকম কুৎসা রটনা করা হয়, চারিত্রিক স্খলন নিয়ে মুখরোচক সব কাহিনি প্রচার করা হয়। সাধারণ মানুষ, এমনকি নারীরা পর্যন্ত তা বিশ্বাস করে। এতে করে সম্মান নিয়ে কেউ সামাজিক-রাজনৈতিক ময়দানে অবাধে বিচরণ করতে পারে না।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা নানাভাবে পিতৃতন্ত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, খাদ্যবণ্টনে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, মেয়েদের ওপর কেবল পারিবারিক দায়-দায়িত্ব চাপানো, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানে অনীহা, নারী নির্যাতন, মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করা, কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও শ্লীলতাহানী, নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নারীকে অধীন করে রাখা ও হীন ভাবা, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানে নারীর ইচ্ছে-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করা, ইত্যাদি হলো ব্যবহারিক জীবনে পিতৃতন্ত্রের রূপ।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে, বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে, নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দারিদ্র্য ও পরিবেশগত চাপে নারী আজকাল গৃহস্থালি গণ্ডির বাইরে জীবিকার অন্বেষণে বের হচ্ছেন। সনাতন কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শহরে নির্মাণশিল্পে বা গ্রামের ক্ষেতখামারে দিনমজুর হিসেবে নারী উপার্জন করে পরিবারের অন্নসংস্থান করছেন বা অন্নসংস্থানে সাহায্য করছেন। রপ্তানি শিল্পে ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে বিভিন্নভাবে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ সংজ্ঞাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার কারণে জাতীয় পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হয় না বলে উন্নয়ন কৌশল ও লক্ষ্য নির্ণয়ে নারীর সমস্যা চিহ্নিত হয় না এবং অর্থনৈতিক অবদান পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে না।

নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিসংখ্যানগত তথ্য বিরাজমান বৈষম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। আয়ুসীমা ও মাতৃমৃত্যুর হার ইত্যাদি নারীর অসম অবস্থানের সূচক। বাংলাদেশে বিরাজমান ব্যাপক অশিক্ষা, অভাব ও অস্বাস্থ্যের কুফলের

---

[২] J. Freeman, *A Room at a Time: How Women Entered Party P*olitics, Lanham, MD: Rowan and Littlefield, 2000, p. 231.

[৩] এ ওয়াই এম একরামুল হক, 'নারীর ক্ষমতায়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', ইত্তেফাক, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

শিকার ব্যাপক হারে নারী। সমাজ কাঠামোর প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অধস্তন ও কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে নারী অধিকতর দুর্ভোগের শিকার হন।

সামাজিক এসব বিধিব্যবস্থার প্রতিবিম্ব দেখা যায় রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রও নির্ভেজাল পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরিচালিত। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি— সবকিছুই পুরুষের অনুকূলে। এ ব্যবস্থায় নারী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিবারে প্রচলিত নিয়মনীতির ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে চিরাচরিত প্রথা ও আচরণ হিসেবে অনুসরণ করা হয়। মেয়েশিশুকে ছেলেশিশুর তুলনায় কম মূল্যবান মনে করা, তার ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করা, নারীর কাজকে অবহেলা করা, ঘরেবাইরে সিদ্ধান্তগ্রহণে পুরুষকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়া, নারীর প্রতি সব রকম অবহেলা ও নির্যাতনকে প্রাত্যহিক অভ্যস্ততায় সহনীয় করে তোলা, এমনকি যত্রতত্র নারীর যৌন হয়রানির শিকারে পরিণত হওয়া আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

নারী দেশের অর্ধেক নাগরিক, অর্ধেক মানব সম্পদ। সেই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে নিষ্পেষিত ও দুর্বল রেখে জাতি কখনোই সবল হতে পারে না। তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হলে তা জাতির শক্তিকে বাড়াবে। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নমাত্রায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং শক্তিসঞ্চয়ন সংযোজন সেজন্য একান্তই অপরিহার্য। তাছাড়া, নারী যে অনন্য ভূমিকা পালন করেন সমাজে সন্তানের জন্মদান, লালনপালন ও সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে, সেই দাবিতেও নারীর সমতা ও উন্নয়নের যুক্তি অনস্বীকার্য। সর্বোপরি মানুষ হিসেবে তাদেরও 'ব্যক্তি' পদমর্যাদার দাবি সংগত। নারীকে 'মানুষ' বা ব্যক্তিত্বের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সকল ধরনের বৈষম্য অসমতা ও নিগ্রহের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারী অধিকার মানবাধিকারের প্রশ্নের সাথে জড়িত। নারীর 'ব্যক্তিসত্তার' প্রশ্ন, নারীর জীবন ও দেহের নিরাপত্তা এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণসংক্রান্ত অধিকারের দাবি নারীকে উন্নয়নের বাহক ও ভোগ স্বত্বাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যুক্তিকে জোরদার করে।

সাঁওতাল নারীর অবস্থান

আমাদের দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী সাঁওতালরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও দুর্বল। সাঁওতাল নারীরা আরো বেশি দুর্বল। তাদের ঐতিহ্যগত আইন এবং প্রথায়ও নারীকে দুর্বল করে রাখারই বিধান কার্যকর রয়েছে। সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তারা সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে— এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। আদিবাসী সমাজব্যবস্থাকে 'সমঅধিকারের সমাজব্যবস্থা' হিসেবেও চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে আসলে আদিবাসী নারীর দুরবস্থাকে আড়াল করে ফেলা হয়। সমাজে সাঁওতাল নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ নির্মম বাস্তবতার চিত্রই ফুটে উঠেছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এবং ধর্ম, সহিংসতা ও নির্যাতন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. অর্থনৈতিক অবস্থা

১.১ সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা

আমাদের দেশে অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত আইন ও প্রথায়ও নারীকে দুর্বল করে রাখার বিধান কার্যকর রয়েছে। সাঁওতালদের মধ্যে সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতে অধিকার শুধু পুরুষেরই। বাবা-মায়ের সম্পদের উত্তরাধিকার হয় ছেলেরা। মেয়েরা কোনো সম্পদই পায় না। কারো পুত্রসন্তান না-থাকলেই কেবল মেয়েরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তির মালিকানা পায়। কোনো মায়ের যদি সম্পদ থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েরা ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। তবে এমন ঘটনা আদিবাসী সমাজে একেবারেই ব্যতিক্রম।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কোনো পরিবারে যদি কোনো নারী বিধবা হন, তাহলেও তারা স্বামীর সম্পত্তির ওপর অধিকার পায় না। স্ত্রী জীবনস্বত্ব পায় মাত্র। তিনি যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন মাত্র স্বামীর সম্পদ ভোগ করতে পারে; কিন্তু তা বিক্রি করতে পারে না। বিক্রির অধিকার শুধু ছেলের, অর্থাৎ পুরুষের।

বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের মতো সাঁওতালদের সমাজব্যবস্থাও পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারপ্রধান বা সিদ্ধান্তগ্রহণের মালিক নারী, এমন সাঁওতাল পরিবার সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় না।[৪] স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি বা বিবাহবিচ্ছেদ হলে স্ত্রী কোনো সম্পত্তিই পায় না। এই সম্পত্তি স্বামীর ভাই অথবা ভাইয়ের ছেলেরা পায়।

[4] BAG, Dhanipati ,1983, Santal Samaj Sameeksha - A Study on Santal Society; Samatat Prakashani; Calcutta; p-2

সাঁওতালরা মনে করে, তাদের যে সামাজিক পঞ্চায়েতব্যবস্থা রয়েছে, সেখানকার পারগানা বা থানা পর্যায়ে আলোচনায় নারীদের সম্পত্তির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আলোচনা ও অনুমোদিত হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সরকারি বিধিও প্রবর্তন করা যেতে পারে।

সমাজে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অবশ্যই সচেতনতা, শিক্ষা ও একতার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তারা মনে করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ এ মত দেয়।

১.২ শ্রম বিভাজন

অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো সাঁওতাল নারী-পুরুষের কাজের মধ্যেও রয়েছে স্পষ্ট শ্রম বিভাজন। এই বিভাজন নারীকে আরো বেশি বঞ্চনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। পুরুষ শুধু বাইরের কাজ করবে— এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা তাদের মধ্যে রয়েছে। পুরুষরা কখনো ঘরের কাজ (বাসন-কাপড় ধোয়া, রান্না, উঠোন-ঘর পরিষ্কার করা, তরকারি কাটা, মসলা বাটা, বাচ্চার যত্ন নেয়া ইত্যাদি) করে না। কিন্তু নারীদের ঘরে ও বাইরে সবখানেই কাজ করতে হয়। তাদের গবাদিপশু পালন, জ্বালানিসংগ্রহ, কৃষি, এমনকি মজুরি কাজের জন্য মাঠেও যেতে হয়। নারীদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নি। তারা গৃহস্থালি কাজ থেকে শুরু করে মাঠের কাজ— সবরকম কাজই করে থাকে। কিন্তু গৃহস্থালি কাজকে স্বামী বা পুরুষরা তেমন স্বীকৃতি দেয় না।

সাঁওতাল নারী-পুরুষের সারাদিন[৫]

সময়	কাজ (পুরুষ)	কাজ (নারী)
সকাল ৬-৯টা	ঘুম থেকে ওঠা, হাতমুখ ধোয়া, নাস্তা করা, গরু-ছাগল বাইরে নিয়ে যাওয়া ও মাঠে চড়ানো, ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, এরপর হালচাষ বা ধান লাগানোর জন্য মাঠে যাওয়া, বিভিন্ন সমিতির সভায় যাওয়া (সাপ্তাহিক), গির্জায় যাওয়া (সাপ্তাহিক), তালগাছ লাগানো, তালের রস সংগ্রহ (মৌসুমী);	ঘুম থেকে ওঠা, হাতমুখ ধোয়া, নাস্তা করা, গরু-ছাগল বাইরে নিয়ে যাওয়া ও মাঠে চড়ানো, ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয়া, এরপর মাঠে ভাত নিয়ে যাওয়া, ধান লাগানো, ধান কাটা, বিভিন্ন সমিতির সভায় যাওয়া (সাপ্তাহিক);
সকাল ৯-১২টা	হাট-বাজার, ঋণ উত্তোলন, বিভিন্ন সংস্থার সভায় যোগদান (মাঝে মাঝে), সার-বীজ-কীটনাশক ক্রয়, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলায় যাওয়া (মাঝে মাঝে), মাটিকাটা ও হালচাষ, ভ্যান, রিক্সা চালানো, ধানের বীজ তোলা;	মাঠের কাজ, কাঁথা সেলাই, ধান শুকানো, কাপড় ধোয়া, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা, লেপা, রান্না-বান্না, গোসল করা, ছেলে-মেয়েকে গোসল করানো, ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়ানো;
দুপুর ১২-৩টা	কাজে যাওয়া, স্নান করা, বিশ্রাম নেয়া, ভাত খাওয়া, গরু-ছাগলকে খাওয়ানো, মৌসুমী সেচ কাজ;	ধান ভানা, রান্না করা, খড়ি ও গোবর কুড়ানো, কাঁথা সেলাই, পাটি বোনা, উঁকুন বাছা;
বিকাল ৩-৬টা	হাটে যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, টিভি দেখা (শুক্র ও শনিবার), বাজার করা, সবজি বিক্রি, খেলাধুলা করা;	গরু-বাছুরকে পানি খাওয়ানো, লেপা-মোছা, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, মাঠ থেকে গরু-বাছুর আনা, শাক তোলা, তরকারি কাটা, মশলা বাটা, কাপড়-চোপড় ঘরে তোলা;
সন্ধ্যা ৬-৯টা	গরু-ছাগল মাঠ থেকে নিয়ে আসা ও গোয়ালে দেওয়া, টিভি দেখা, দোকানে বসে থাকা, আড্ডা দেওয়া, ছোট বাচ্চাকে মাঝে মাঝে কোলে নেয়া, বাচ্চাদের পড়ানো, গান-বাজনা করা, নেশা করা।	গরু-ছাগল গোয়ালে দেওয়া, হারিকেন মোছা, বাতিতে তেল ঢালা, বাতি জ্বালানো, ছেলে-মেয়েকে হাতমুখ ধোওয়ানো, বিছানা গোছানো, ছেলে-মেয়েকে পড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমাতে যাওয়া।

তবে সাঁওতাল পুরুষরা সাধারণত ভারী বা কঠিন কাজ করে থাকে; যেমন হালচাষ, মাটিকাটা, ঘর ছাউনি। তারা মাথায় ও কাঁধে বস্তার ভার বহন করে। তারা ভ্যান চালায়, রিক্সা চালায়। নারীদের চেয়ে পুরুষরা বেশি ভারী কাজ করে।

কোনো কোনো এলাকায় কিছু কাজের ব্যাপারে সাঁওতাল নারীদের ওপর অলিখিত সামাজিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সামাজিক রীতির কারণে মেয়েরা কোদালের কাজ, ঘর ছাওয়া বা হাল বাওয়ার মতো কাজ করে না। এসব কাজ করলে সম্মানহানি হবে বলে মনে করা হয়। এতে ছেলেরা লজ্জাবোধ করে। মেয়েরাও পুরুষের 'সম্মানের' কথা বিবেচনা করে এ জাতীয় কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এর অন্যতম কারণ হলো সমাজের সর্বত্র বিরাজমান পুরুষাধিপত্য। পুরুষরা মনে করে, ভারী কাজ বা অধিক শক্তির কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। কারণ তাদের শক্তি কম। মেয়েরাও পুরুষদের এই চাপিয়ে দেয়া ধারণা বিশ্বাস করে[৬]। এই সম্প্রদায়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজের বিভাজন পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এটা তাদের রীতিতে পরিণত

[৫] পিআরএ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, মধুমাঠ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

[6] Bodding, P.O., Traditions and Institutions of the Santals, 2001, New Delhi, Gyan. p-34

হয়েছে। এটা এমনই বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছে যে, এর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অনুভবও করে নি, করতেও চায় নি।

১.৩ মজুরি বৈষম্য

সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা থেকে শুরু হয় নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য। এরপর পারিবারিক শ্রমবিভাজন প্রথা তাদের আরো বেশি বঞ্চনার মুখে ঠেলে দেয়। পুরুষরা ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে শুধু মাঠের কাজ বা বাইরের কাজ করে। গৃহস্থালি কাজে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। অথচ সেই নারীকেই পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘরের ও বাইরের সব কাজে সমান ভূমিকা পালন করতে হয়। কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারীকেই অধিক শ্রম দিতে হয়। এর পাশাপাশি গৃহস্থালি কাজ, সন্তান দেখাশোনা, পানি ও জ্বালানি সংগ্রহ, রান্নাবান্না, এমনকি বাজার করাও তাদের কাজের অংশ। কিন্তু সবক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় নারীর অধিকারকে কোনোভাবেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে দেখা হয় দুর্বল হিসেবে। এই 'দুর্বল'দের ওপরই সব কাজের বোঝা চাপিয়ে পুরুষরা নারীর ওপর অমানবিক জুলুম চালিয়ে আসছে যুগের পর যুগ ধরে[7]। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে সৃষ্ট এই শ্রমবৈষম্য আদিবাসী নারীকে চরম নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অবশ্য পুরুষরা এটাকে 'নির্যাতন' হিসেবে মানতে নারাজ। নারীরাও এটাকে নিয়ম এবং 'নিয়তি' মনে করে; নির্যাতন হিসেবে দেখে না।

সাঁওতাল নারীরা পুরুষের মতো কৃষি বা মাটিকাটার কাজ করলেও উভয়ের মধ্যে মজুরির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পুরুষ ১০০ টাকা পেলে নারী পায় ৮০ টাকা। এলাকার বাইরে কাজে গেলে বাঙালি অথবা আদিবাসীদের মজুরির পার্থক্য থাকে। তবে এলাকায় কাজের মজুরি বাঙালি এবং আদিবাসীদের সমপর্যায়ের। মজুরি কাজে নারীরা অলসতা কম করে কিন্তু সে তুলনায় মজুরি পায় না।

নারীদের কম মজুরি পাবার ক্ষেত্রে পুরুষদের অভিমত হচ্ছে, মেয়েরা দেরি করে কাজে যায়। কারণ তাদের দৈনন্দিন ঘরের কাজ শেষ করে কাজে যেতে হয়। এতে করে তারা ৯-১০টার আগে কাজে যেতে পারে না। কিন্তু পুরুষরা সকাল-সকাল কাজে যেতে পারে। তারা এ-ও মনে করে যে, নারীরা বেশি কাজ করতে পারে না। তাদের শরীর দুর্বল। এসব যুক্তির সঙ্গে নারীরাও একমত পোষণ করে।

নানারকম অবাঞ্ছিত ঝামেলা ও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় বলে নারীরা দূরের কোনো জায়গায় সহজে যেতে চায় না, গেলেও কাজ পায় না। ফলে বাধ্য হয়েই কম মজুরিতে নিজ এলাকায় নারীরা কাজ করে। এটাকেই সাঁওতাল পুরুষরা নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান মজুরি বৈষম্যের সবচেয়ে বড়ো কারণ হিসেবে উল্লেখ করে।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাঁওতাল নারী-পুরুষের মধ্যেও মজুরির বৈষম্য রয়েছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। রাজশাহীর গোদাগাড়ী অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা মূলধারার বাঙালি জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি মজুরি পায়। তাদের মতে, বাঙালিরা বেশি ভালো কাজ করতে পারে না। কারণ তাদের তেমন অভ্যাস নেই। পক্ষান্তরে সাঁওতালরা যুগ যুগ ধরে কৃষিভিত্তিক মজুরি-কাজের ওপরই নির্ভরশীল। এ কাজে তাদের বিশেষ দক্ষতাও গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে আদিবাসী পুরুষ ১০০ টাকা মজুরি পেলে বাঙালিরা ৬০/৭০ টাকা পায় বলে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা জানায়।

অন্যদিকে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী অঞ্চলের সাঁওতাল আদিবাসীদের ভাষ্য মতে, বাঙালি ও আদিবাসী পুরুষের সমান মজুরি থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। সাঁওতাল নারীরা দৈনিক ৮০ টাকা মজুরি পেলেও বাঙালি নারীরা পায় দৈনিক ৬০ টাকা করে। এর কারণ সাঁওতালরা বাঙালি নারীদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারে।

সাঁওতাল পুরুষদের মতে, সংসারে পুরুষ বেশি আয় করে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো সাঁওতাল নারীর অভিমত হচ্ছে, নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি আয় করে। তবে অনেকের অভিমত হলো, সংসারে কাজ বেশি করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষরাই আয় বেশি করে।

পুরুষদের মতে, এই আয় খরচের সিদ্ধান্ত নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে করে থাকে। অন্যদিকে নারীদের অভিমত হচ্ছে, নারীরা সংসারে আয় করলেও খরচের সিদ্ধান্ত পুরুষরাই গ্রহণ করে থাকে। হাতে গোনা দুয়েকটি পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়েই খরচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সংসারে কী কী প্রয়োজন সে তালিকা নারীরা করে বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটা কেনা হবে, কতটুকু কেনা হবে সে সিদ্ধান্ত পুরুষেরই।

অর্থ উপার্জনমূলক কাজ পেতে আদিবাসী নারী/পুরুষ উভয়ের সমস্যা হয়। ইদানীং বাঙালিদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। মজুরের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তারা কাজের জন্য মালিকের কাছে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে।

[7] SAHU, Chaturbhuj, The Santhal Women: A Social Profile; Sarup & Sons; New Delhi; 1996, p-76

অনেক ক্ষেত্রে কম মজুরিতে কাজ করে। এই প্রতিযোগিতায় আদিবাসীরা অনেকটাই পিছিয়ে। ফলে অনেক সময় তাদের কাজ পেতে সমস্যা হয়। কাজ পেতে সমস্যা হলেও মজুরি পেতে তেমন সমস্যায় পড়তে হয় না। তবে মাঝে মধ্যে দিনের মজুরি দিনে না দিয়ে একদিন বা দুদিন পরে দেয়। অবশ্য মালিকরা এটা বলে-কয়েই করে।

উপার্জিত অর্থ পুরুষরা সংসারের কাজেই ব্যয় করে। অনেক সময় তারা পোশাক-পরিচ্ছদ কেনে। কেউ কেউ উপার্জিত অর্থ দিয়ে পান, বিড়ি, সিগারেট, বন্ধুদের খাওয়ানো, নেশা করা ইত্যাদি কাজে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করে। তবে এ ব্যাপারে একজন সাঁওতাল নারী প্রশ্ন তোলেন, আমরা উপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারি বটে; কিন্তু অভাবের সংসারে স্বাধীনভাবে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ কোথায়?

অন্যদিকে নারীরা পুরুষের সিদ্ধান্তে উপার্জিত অর্থ সাংসারিক খাতে খরচ করে। অনেক ক্ষেত্রে মজুরির টাকা নারীর হাত থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষের কাছেই চলে যায়। নারী ও পুরুষের যৌথসিদ্ধান্তে সংসারের যাবতীয় ব্যয় বা কেনাকাটা হলেও ব্যয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অনেকে তৈজসপত্র, হাঁস-মুরগি, কাপড় ইত্যাদি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা উপার্জিত অর্থ খরচ করার পূর্বে পুরুষের অনুমতি নিয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা স্বামীর অগোচরে সিঁদুর, চুড়ির মতো ছোটখাটো কেনাকাটা করে। টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের কাছে জবাবদিহি করলেও পুরুষ তা করে না। তারা স্বাধীনভাবে টাকা ব্যয় করে।

আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে এনজিও প্রচলিত বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচি চালু আছে। আগে সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় ও তার পর কিস্তির ভিত্তিতে ঋণ প্রদান। এই ঋণের জন্য নারীদের সমিতির সদস্য হতে হয়। এসব সংস্থা থেকে নারীরা ঋণ নিয়ে থাকে।

নারীরা ঋণ নিলেও তারা তা ব্যবহার করে না। ওই ঋণের টাকা পরিবারের পুরুষ সদস্য বা গৃহকর্তা ব্যয় করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঋণের টাকা গবাদিপশু পালন, সার-বীজ-সেচ, ঘরবাড়ি তৈরি বা মেরামত, ছেলে-মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে নারীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ঋণের টাকা পুরুষের হাত দিয়ে ব্যবহার হওয়ার মাশুল গুণতে হয় নারীদের। তারা কিস্তির টাকা সময় মতো নারীর হাতে তুলে দেয় না। এতে সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী সংস্থার কাছে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইদানীং আদিবাসী নারীরাও অভাবের তীব্রতা বা আর্থিক সংকটের কারণে সস্তা শ্রম বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া অনভ্যাসের কারণে তারা তাদের এই ভূমি ও কৃষি-নির্ভরতার গণ্ডি পেরিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র উৎপাদন ও কুটিরশিল্পে নিজেদের যুক্ত করতে পারে না। তাদের সেই দক্ষতা ও মানসিকতা কোনোটাই নেই। তাই কৃষিকাজের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা তাদের আরো বেশি শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত করে রেখেছে।

তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, সমাজে যে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে, তার ভয়াবহতম শিকার হচ্ছেন আদিবাসীরা। তারা দ্রুতই সহায়-সম্বল হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও সাঁওতালদের মধ্যে কোনো শ্রম বিক্রি ছিল না। গ্রামের সবাই মিলে প্রতিবেশীদের কাজ করে দিত। সেখানে কোনো মজুরি লেনদেন ছিল না। এভাবে একে অপরকে সাহায্য করাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'মাংনা কামলা' বা 'হাউলি' বলা হতো। এখন আদিবাসীরা বাঙালিদের কাজ তো করেই, কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জমিতেও মজুরি খাটে।

১.৪ কর্মক্ষেত্রে বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতা

সাঁওতাল নারীরা বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও কর্মক্ষেত্রে সীমাহীন বঞ্চনার স্বীকার হয়। তাদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কাজ দেয়া হয়, কিন্তু বেতন দেয়া হয় কম। এভাবে ব্যাপক বৈষম্য আর বঞ্চনা মেনে নিয়ে সাঁওতাল নারীরা কাজ করেন সামান্য দুমুঠো ভাতের আশায়।

নারীরা পুরুষের পাশে থেকে পারিবারিক দায়দায়িত্ব সামলে থাকে, যা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়েও বেশি; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, সমাজে তাদের এই ভূমিকার স্বীকৃতি মেলে না। বরং পরিবারের হালধরা নারীদের সমাজে বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়। পারিবারিক কাজে তাদের ঘরের বাইরেও যেতে হয়। আর এতে অনেকসময় তাদের খারাপ বা নষ্ট মেয়ে বলা হয়। একজন নারী সৃষ্টিশীল ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজে তার যথাযথ স্বীকৃতি নেই।

আর পেশা বা কাজের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের রয়েছে সীমাহীন নিরাপত্তাহীনতা। প্রায়ই তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পুরুষের লালসার শিকার হতে হয়। কর্মক্ষেত্র তো বটেই, এমনকি আসা-যাওয়ার পথের মাঝেও তারা সমান নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়।

২. শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়; কিন্তু আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে দেখা গেছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার এখনো অত্যন্ত শোচনীয়। এক সময় আদিবাসী সাঁওতাল

পল্লিগুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্তমানে বিভিন্ন এনজিওপ্রবর্তিত, এমনকি সরকারি স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপরও তাদের মধ্যে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। সাঁওতালদের মধ্যে হাতেগোণা দু-চারজনই আছেন, যারা গ্রাজুয়েট। মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করাটাই তাদের কাছে 'উচ্চশিক্ষা', অবশ্য এই হারও অত্যন্ত কম।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে তারা ভাষাগত সমস্যা, অসচেতনতা, দারিদ্র্যের কারণে অল্প বয়সে উপার্জনমুখী কাজে যুক্ত হওয়া বা মাঠের কাজে যাওয়া, লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করতে না-পারা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করে। তবে তাদের অনেকের মতে, লেখাপড়া না-করার পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ ভাষাগত সমস্যা। পরিবারে এবং নিজেদের সমাজে সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। তারা বাংলাভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারে না। কিন্তু স্কুলে গেলে সেই আদিবাসী সাওঁতাল শিশুটিকে বাংলাভাষায় কথা বলতে হয়, লেখাপড়া শিখতে হয়। ফলে সে প্রথম কয়েক মাস স্কুলে যায়; এরপর আর যেতে চায় না। অধিকাংশ আদিবাসী শিক্ষার্থী এ কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে।

আর্থিক অনটনের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা বা আগ্রহের অভাবকেও বড়ো প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকে, বিশেষত নারীরা। তাদের মতে, সন্তানদের লেখাপড়া শেখালে অনেক দূর পর্যন্ত শেখাতে হবে এবং এতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হবে— এই কারণে অনেকে সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে চায় না। তাছাড়া লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পাওয়া যাবে না— এমন মনোভাবের কারণেও অনেকে সন্তানকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী।

ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁওতাল নারী এবং পুরুষ উভয়েই ছেলের শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা মনে করে, ছেলেরা ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা বড়ো হয়ে পরিবারের হাল ধরবে। বাবা-মাকে খাওয়াবে। আর মেয়েদের বিয়ে হলে পরের বাড়ি চলে যাবে। কাজেই পড়াতে হলে ছেলেদেরই পড়ানো উচিত বলে তারা মনে করে।

সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা একেবারেই কম। অনেকে বিভিন্ন সংস্থার ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা কোনোমতে নাম স্বাক্ষর করতে শেখে। তারা নাম স্বাক্ষর করতে পারলেও লিখতে-পড়তে বা হিসাব করতে পারে না। সাঁওতাল মেয়েরা ইদানীং দুএকজন হাইস্কুলে পড়লেও স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পর্যন্ত এগোতে পারে না। মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি হওয়ায় নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তীব্র অভাবের কারণেও মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে কিছুটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখানো উচিত বলে মনে করছে এবং লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

৩. স্বাস্থ্য

শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া দারিদ্র্যকবলিত সাঁওতালদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চিত্রও অত্যন্ত করুণ। অপরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-সচেতনতার অভাব এর মূল কারণ।

তুলনামূলকভাবে সাঁওতাল নারীরা অসুখে কম ভোগে। তারা সাধারণত অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা ও সূতিকারোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এছাড়া সর্দিকাশি, কালাজ্বর, জন্ডিস, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেটব্যথা, চুলকানি, আমাশয়, খোশপাঁচড়া ইত্যাদি রোগও হয়। স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে তারা গ্রাম্য ডাক্তার ও কবিরাজের কাছে কিংবা নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়। তবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পাবার ক্ষেত্রে তাদের অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাঁওতালদের অবহেলা এবং তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়।

সাঁওতালরা সন্তান প্রসবের জন্য বাড়িকেই উত্তম বলে মনে করে। স্থানীয় অপ্রশিক্ষিত দাইরা সন্তান প্রসবে সহযোগিতা করে। তারা হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে যেতে বড়ো বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। এইদিক থেকে তারা অসচেতন। গ্রামের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও এই পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে কারো তেমন আগ্রহ নেই। তারা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নয়। অসচেতনতা ও সংস্কারের কারণে পরিবার পরিকল্পনা শুধু নয়, উপযুক্ত চিকিৎসা সেবাও তারা নিতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, চিকিৎসার জন্য নারীরা ডাক্তারখানায় না-গিয়ে পুরুষদের পাঠায় এবং তারাই নারীদের জন্য ওষুধ নিয়ে আসে।

৪. সামাজিক অবস্থান

সামাজিকভাবে সাঁওতাল নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখা হয় না। তাদের মধ্যে পুরুষরা প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে সমাজে পুরুষদের কর্তৃত্ব প্রাধান্য পায়। সাঁওতাল নারীদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা মোটেও ইতিবাচক নয়। উৎসব, অনুষ্ঠান, বিচার-সালিশ, কোথাও নারীরা মূল ভূমিকা পালনের কোনো সুযোগ পায় না। কী ব্যক্তিগত, কী সামাজিক, কোনো ক্ষেত্রেই নারীর মতামত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই বা নারীর মতামত নেয়া হয় না। সমাজ ও পরিবারে পুত্রসন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেরা সম্পত্তির মালিক হয়। সামাজিকভাবে পুত্রসন্তান বেশি গ্রহণযোগ্য এই জন্য যে, মেয়েরা ভবিষ্যতে স্বামীর বাড়িতে চলে যাবে।

একান্নবর্তী পরিবারে পুরুষ আগে মেয়েরা সবার পরে খায়। কিন্তু একক পরিবারে নারী-পুরুষ একসাথে খায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নারীরা পরে খায়। নারীরা যেহেতু খাবার পরিবেশন করে কাজেই সবার খাওয়া শেষ হলে তাকে খেতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই নারীর ভাগে কম খাবার জোটে।

আপাতদৃষ্টিতে পরিবারে নারী-পুরুষের খাবারের মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত মানে কোনো তারতম্য থাকে না। তবে পুরুষরা হাটে-বাজারে-দোকানে গিয়ে চা-নাস্তা খেতে পারে। নারীরা ঘরের কাজে বেশি সময় দেয়ায় তাদের সে সুযোগ নেই। তাছাড়া নারীরা খাবার ব্যবস্থাপনা করে বলে সবার মধ্যে বিলি-বণ্টন শেষে যা থাকে তারা সেটুকুই শুধু খায়। ফলে নারীর বিশেষ করে গৃহকর্ত্রীর ভাগে তুলনামূলকভাবে কম খাবারই জোটে।

নিঃসন্তান নারী বা দম্পতিকে পরিবার স্বাভাবিক চোখে দেখলেও সমাজের কেউ কেউ অন্যচোখে দেখে। তাদের বাঁজা বা অপয়া বলে আড়ালে-আবডালে মন্তব্য করা হয়, সামাজিকভাবে হেয়জ্ঞান করা হয়, 'বন্ধ্যা' বা 'বাঞ্জি' বলে টিটকারি দেয়া হয়।

৪.১ সামাজিক কাঠামো ও বিচার-আচার

আদিবাসী সাঁওতালদের ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সামাজিক কাঠামো (পঞ্চায়েত) আছে; কিন্তু ওই কাঠামোতে নারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই[৮]। ফলে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে নারীরা তেমন কোনো দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায় না। সাঁওতালদের 'মাঝি পরিষদ' (গ্রাম পঞ্চায়েত, সাঁওতালদের উচ্চারণে 'মাঞ্জি পরিষদ')-এ নারীদের রাখা হয় না। কারণ মনে করা হয় নারীদের বুদ্ধি কম, কথা বলতে পারে কম। বুদ্ধি নেই বলে তারা গোল বাঁধায়। ফলে পরিবারের দ্বন্দ্ব সমাধানের উদ্যোগ পুরুষরাই গ্রহণ করে থাকে। পুরুষদের এ ধরনের মন্তব্যের ব্যাপারে নারীদের কোনো ভিন্নমত নেই। অর্থাৎ তারাও নিজেদের অযোগ্য বা হীন মনে করে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একতরফাভাবে সামাজিক বিচার কাজ সম্পাদিত হয়। আদিবাসী সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করছে, যা নারীর অগ্রগতি, সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে।

৪.২ বিয়ে

পারিবারিকভাবে ঘটকের মাধ্যমে সামাজিক রীতি অনুসরণ করে সাধারণত সাঁওতালদের বিয়ে হয়। প্রথমে মেয়ের বাড়িতে, পরে ছেলের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। যারা খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করেন, তাদের বিয়ে চার্চে হয়। তবে বিয়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গোত্রের সাঁওতালদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

সাধারণত বিয়ের আগে নিমন্ত্রণপত্র দেয়া থেকেই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে যায়। যেমন নিমন্ত্রণের সময় সুতার মধ্যে ৮টি গিঁট দিয়ে সেই সুতা নিমন্ত্রণের কার্ড হিসেবে দেয়া হয়। এরপর বিয়ের আগের দিন মেয়েদের হলুদ মাখানো হয়। মাড়ুয়া তৈরি করার পূর্বে মাঝিপ্রধান, পারানিক ও জগমাঝিদের ডাকা হয়। তাদের বিনোদনের জন্য হাড়িয়া দেয়া হয়। বিয়েতে বরের পক্ষ থেকে কনের জন্য দেওড়া বা ডালি আনা হয় এবং সেই ডালিতে বউকে বসানো হয়। বরের পক্ষ থেকে ৭ জন বউকে ডালিতে বসিয়ে ওপরে তোলে এবং বরের ভগ্নীপতি বা দুলাভাই বরকে কাঁধে করে নিয়ে কনের সামনে যায় ও কনের ঘোমটা খুলে আমের পাতা ভিজিয়ে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। এরপর কনেকে সিঁদুর পরানো হয়। সিঁদুর পরানোর মধ্য দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং এরপর থেকে তারা সমাজে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হয়[৯]।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ১৩-১৪ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বেশি বয়স হলে মেয়েদের বিয়ে দিতে সমস্যা হতে পারে মনে করে তারা কম বয়সে বিয়ে দেন। বেশি বয়স হলে অনেকে মেয়ের চরিত্র খারাপ বলে অপবাদ দেয়[১০]।

সাঁওতালদের মধ্যে যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী তাদের বিয়ের রেজিস্ট্রি হয় না; তবে সমাজে প্রমাণ রাখার জন্য বিয়ের সময় পাতা ও ঘটি দিয়ে প্রমাণ রাখা হয়। এই পাতা ও ঘট বা ঘটি মাঝি পরিষদের কাছে সংরক্ষিত থাকে। তারা মাঝিকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিয়েল রেজিস্ট্রি হয়, স্বামী-স্ত্রীর খাতায় নাম ও স্বাক্ষর নেয়া হয় এবং যারা সাক্ষী হিসেবে থাকেন, তাদের নাম ও স্বাক্ষর নেয়া হয়। বিয়েতে ছেলে-মেয়ের মত কোনো পরিবারে নেয়া হয়, কোনো পরিবারে নেয়া হয় না। বিয়েতে কোনো যৌতুক দিতে হয় না, তবে খুশিমনে ছেলেপক্ষকে সাধ্য অনুযায়ী চাল কিংবা ধান দেয়া হয়।

---

[8] Somers, George E., 1985, Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society, Abhinav

[9] Chaudhuri, A.B., 1993 State formation among tribals: a quest for Santal identity (New Delhi)

[10] Mukherjee, C.L. 1962. The Santals. Calcutta: A. Mukherjee

৪.৩ বিয়ে বিচ্ছেদ

সাঁওতালদের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদ বা তালাক সামাজিকভাবে স্বীকৃত। এ ব্যাপারে প্রথাগত নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অনেক সময় পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে নারীরা বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সমাজের চোখে সেটি অসম্মানের। যদি কোনো নারী বিয়ে বিচ্ছেদ চায়, তাহলে সমাজের ১০ জনের সামনে সেই বিয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলে ও ঘটে রাখা পানি পা দিয়ে ফেলে দেয়। এভাবে গ্রামপ্রধান বা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও উভয় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। ছেলে বা মেয়ে উভয়েই তালাক দিতে পারে। তবে সাঁওতাল সমাজে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা খুবই কম ঘটে।

তালাকপ্রাপ্ত মেয়েদের সামাজিক গঞ্জনা ও কটূকথা সহ্য করতে হয়। স্বামীর ঘর করতে না-পারাটাকে বিশেষ অযোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়। তালাকপ্রাপ্ত মেয়েরা পুনরায় বিয়ে করতে পারে। যারা আবার বিয়ে করে তারা সাধারণত বিপত্নীক বা বেশি বয়সী ছেলেদের বিয়ে করে থাকে। বিচ্ছেদের পর সন্তানের অধিকার পুরুষরা পায়। তবে কোনো দুধের বাচ্চা থাকলে সে বড়ো না-হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকে। বাচ্চা বড়ো হলে সে তার ইচ্ছেমতো বাবা বা মায়ের কাছে থাকতে পারে।

৪.৪ বিধবাদের অবস্থা

সাঁওতালদের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে। তবে কোনো সন্তান-সন্ততি থাকলে সাধারণত মেয়েরা দ্বিতীয় বিয়ে করে না। যাদের ন্যূনতম সহায়-সম্পত্তি আছে, সন্তান-সন্ততি বড়ো, তারা স্বামীর ভিটাতেই থাকে। অন্য ক্ষেত্রে বাবার বাড়িতে চলে যায়। বিধবাদের সাথে সাধারণত বয়স্ক পুরুষের বিয়ে হয়, বিধবার যদি বড়ো ছেলে-মেয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্বামীর বাড়িতে থাকে, আর ছেলে-মেয়ে না-থাকলে বাবার বাড়িতে থাকে। আদিবাসী সমাজে বহুবিবাহের নিয়ম নেই। তবে কোনো কোনো পুরুষ একাধিক বিয়েও করে থাকে (স্ত্রী মারা গেলে বা সন্তান না-হলে)। একাধিক বিয়ে করাকে সমাজে খারাপ চোখে দেখা হয়।

৫. সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাঁওতাল নারীদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। সর্বক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য থাকে। পুরুষরাই পরিবারপ্রধান হয়ে থাকে। সাঁওতাল সমাজের নিয়ম অনুযায়ী পুরুষরা যা বলে, নারীরা তা শুনতে বাধ্য থাকে। কারণ পুরুষ সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। তারা বংশ রক্ষা করবে, সংসার পরিচালনা করবে[১১]। পুরুষের শক্তি বেশি, শিক্ষা বেশি। তাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী সংসারে কী রান্না হবে— পুরুষ সেটাও বলে দেবে। ছেলেমেয়ের শিক্ষা, বিয়ে, নাম রাখা ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সন্তান ধারণ ও লালনপালনের সিদ্ধান্তও নারীরা দিতে পারে না। এ ব্যাপারেও তাদের পুরুষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। পুরুষরা যদি আরেকটি সন্তানের প্রয়োজন মনে করে, তবে নারীকে সে প্রস্তাবে সায় দিতে হয়[১২], কেননা নারীর মতামতের এক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব নেই।

উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেরা সম্পত্তির মালিক হয় বলে সাঁওতালদের মধ্যে পুরুষদেরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এভাবে পারিবারিক পর্যায়ে নারীরা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়।

৬. নির্যাতন ও সহিংসতা

সাঁওতালদের সাথে কথা বলে দেখা গেছে, নির্যাতন বিষয়ে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। নির্যাতন বলতে তারা শারীরিক নির্যাতনকেই বুঝে থাকে। তাদের কাছে কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করাই হচ্ছে নির্যাতন। কিন্তু তাদের মধ্যে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। পুরুষের সিদ্ধান্ত না-মেনে চললে নারীদের অনেক সময় শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এছাড়া কাজ নিয়ে, সংসারের আয় উপার্জন, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ হয় বেশি। তবে সব বিবাদের প্রধান কারণ হচ্ছে পুরুষের মাত্রাতিরিক্ত নেশাগ্রহণ। পুরুষরা মদ পান করে বেসামাল আচরণ করে। তখন স্ত্রী স্বামীর কোনো অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলেই তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। আবার অনেক সময় অভাবের কারণেও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। পারিবারিক পর্যায়ে নারীরা মৌখিক, শারীরিক, মানসিক সব রকম নির্যাতনেরই শিকার হয়ন।

সাঁওতাল নারীরা বাইরে কাজ করতে গেলে অনেক সময় বাঙালিদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। বিশেষত তারা কাজের যোগানদাতা বাঙালি মালিক দ্বারা নির্যাতিত হয়। অনেক সময় মালিকরা খারাপ কথা বলে, কম মজুরি দেয়। তাদের ভাষার জন্য টিটকারি করে। বাইরে কাজ করতে গেলে মেয়েরা সাধারণত যৌন হয়রানির শিকার হয় বেশি। নিজ সম্প্রদায়ের সাঁওতাল পুরুষের

[11] CHOUDHURY, Asit Baran, Saontal Samaj, Daini O Bartaman Sankat-The Society of Saontal; A. Mukherjee and Co. Pvt. Ltd.; Calcutta; 1985, p-13

[12] Culshaw, Wesley J. 1949. Tribal Heritage: A Study of the Santals. London: Lutterworth, p-28

দ্বারাও নারীরা মাঝে মাঝে নির্যাতনের শিকার হয়, তবে তা খুব কম। যদি তেমন কোনো যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে, তবে সামাজিকভাবে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়।

নির্যাতিতা নারীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেতিবাচক। তাদেরকে আলাদা চোখে দেখা হয়। নির্যাতিত নারীকে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুদ্ধ হতে হয়। নির্যাতিতার পরিবারকে গ্রামপ্রধানদের খাওয়াতে হয়। নির্যাতিত নারীরা সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তাদের ভালো বিয়ে হয় না। ভালো ছেলেরা নির্যাতিত হওয়াকে খুঁত মনে করে, সমাজ নির্যাতিতদের 'চরিত্রহীন' বলে আখ্যা দেয়।

আর নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে আদিবাসীদের বিপদে পড়তে হয়। এজন্য নির্যাতনের ঘটনার বড়ো বেশি প্রতিবাদ তারা করে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনাগুলো প্রকাশ পায় না। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিশেষ স্পর্শকাতরতা রয়েছে। এসব বিষয় জানাজানি হওয়ার চেয়ে গোপন রাখাটাকেই সবাই বেশি নিরাপদ মনে করে।

নির্যাতিত নারীরা সাহায্যের জন্য প্রথমে পরিবারে, পরে পরিবারের মাধ্যমে কমিউনিটির কাছে যায়। এ ব্যাপারে কমিউনিটির ভূমিকা দুর্বল। অনেকে ইউনিয়ন পরিষদ বা থানায়ও বিচারের জন্য যায়। কিন্তু তেমন কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না বলে হতাশ হয়ে পড়ে।

প্রচলিত আইনি ব্যবস্থায় তেমন কোনো উপকার পাওয়া যায় না। তাছাড়া সবাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পক্ষেই ভূমিকা পালন করে। আদিবাসীদের পক্ষে তেমন কেউ কথা বলে না। থানা, পুলিশ, ইউনিয়ন পরিষদ কেউই না। মামলা মোকদ্দমা দায়ের, মামলা পরিচালনা এবং সুবিচার পাবার প্রধান প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাগুলো হচ্ছে অসচেতনতা, অর্থের অভাব, অশিক্ষা ইত্যাদি। কোন সমস্যার জন্য কোথায় বা কার কাছে যেতে হবে— এটাই বেশিরভাগ মানুষ জানে না। আর মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার টাকা যোগাড় করার সামর্থ্য অধিকাংশ আদিবাসী পরিবারের নেই। আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতির অভাবের কারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিচারক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবাই বাঙালিদের প্রতিই দুর্বলতা প্রদর্শন করে।

সমাজে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মনোভাব পরিবর্তন, আইনকানুনের যথাযথ প্রয়োগ, দেশের সকল নাগরিক ও সম্প্রদায়কে সমান চোখে দেখার মানসিকতা ইত্যাদি থাকা দরকার।

৭. ধর্ম

নারী-পুরুষ সমভাবে সকল সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে পারে না। ধর্মীয়ভাবে পূজার ক্ষেত্রে মাঝি পরিষদের মধ্যে পারানিক পূজা সম্পন্ন করে থাকে। পরে অসমাপ্ত কাজ নারীরা করে। বর্তমানে সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তো বটেই, এমনকি যারা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে নারীদের অধস্তন করে রাখা হয়েছে। নারীরা পাদ্রী বা যাজক হতে পারে না।

৮. সাঁওতাল নারীদের বৈষম্য ও বঞ্চনার আরো কিছু কারণ

৮.১ নেতিবাচক ঐতিহ্য

আদিবাসী সমাজে মদ একটি প্রচলিত পানীয়, যা ঐতিহ্য বলে দাবি করা হয়। কিন্তু মদের প্রভাব যদি আমরা পারিবারিক পর্যায়ে দেখি, তাহলে দেখব নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রেই এর ভূমিকা প্রধান। অধিকাংশ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে পুরুষদের মদ্যপানের পর। বেশিরভাগ আদিবাসী পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নিয়মিত মদ পান করে এবং ঘরে ফিরে স্ত্রীর ওপর জুলুম-নির্যাতন চালায়। অনেক পুরুষ কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন না-করেও বসে বসে মদ্যপান করে এবং বউ পেটায়। এটা যেন ওদের একটা নিয়মিত কাজ। চু, হাড়িয়া, মহুয়া ইত্যাদি দেশি মদ পান করে পুরুষরা আদিবাসী নারীর ওপর যেভাবে নির্যাতন চালায়, তাতে করে মনে হয় তারা এখনো মধ্যযুগেই রয়ে গেছে।

৮.২ পণপ্রথা ও বাল্যবিয়ে

বেশিরভাগ আদিবাসী পরিবার পিতৃপ্রধান হওয়ায় পরিবারে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। পরিবারপ্রধানের (পুরুষ) একক সিদ্ধান্তে পরিবার পরিচালিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায় কন্যাসন্তানকে এখনো বোঝা মনে করে। এর অন্যতম একটি কারণ বিয়েতে প্রচলিত পণপ্রথা, যদিও আদিকালে আদিবাসী সমাজে পণ বা যৌতুকপ্রথা প্রচলিত ছিল না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আদিবাসীরা এই বাজে প্রথাটি গ্রহণ করেছে।

আদিবাসী সমাজে মেয়েরা ব্যাপক মাত্রায় বাল্যবিয়েরও শিকার। অভিভাবকরা মনে করে, মেয়ের বয়স বেড়ে গেলে সমাজে যোগ্য পাত্র পাওয়া যাবে না। যৌতুক বেশি লাগবে, এই অবস্থা সাঁওতালসহ যেসব সম্প্রদায় শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত। তবে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবার সদস্যদের অজ্ঞতার কারণেও মেয়েরা বাল্যবিয়ের শিকার হয়।

৮.৩ কুসংস্কার

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অসচেতনতার কারণে সাঁওতাল নারীরা বিশ্বাস করে যে, স্বামী দেবতাতুল্য, তার নাম মুখে উচ্চারণ করা বা কোনোভাবে তাকে অসম্মান করাটা পাপ[১৩]। ফলে তারা পুরুষদের হাতে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দেয়। পুরুষ মাতাল-লম্পট যাই হোক না কেন, তাকেই নারীরা শ্রেয়জ্ঞান করে। এমনকি ঘরে এসে পেটালে বা নির্যাতন করলেও নারীরা এটাকে তেমন অন্যায় মনে করে না। ফলে আদিবাসী সমাজে সবক্ষেত্রে পুরুষের একক কর্তৃত্ব বিরাজমান। সামাজিক কর্মকাণ্ড ও বিচার-সালিশে সিদ্ধান্তগ্রহণের কোনো ক্ষমতাই নারীর হাতে নেই। ক্ষমতায়নের দিক থেকে আদিবাসী নারীর অবস্থান একেবারেই প্রান্তে।

৮.৪ তথাকথিত আধুনিকতা ও আদিবাসী নারীর নিঃস্বকরণ

সাঁওতাল নারীর অস্তিত্ব বন ও ভূমির ওপর নির্ভরশীল। এই বন ধ্বংস ও ভূমিগ্রাসের সাথে সাথে নারীর অস্তিত্বও বিপন্ন হতে চলেছে। বিলুপ্ত হতে চলেছে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

অরণ্যের সঙ্গে সাঁওতাল নারীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। রহস্যময় অরণ্য ভেদ করে তারা সংগ্রহ করত খাদ্য সংগ্রহের উপকরণ, জ্বালানি ও ঔষধ। পরিবার পরিচালনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, সামাজিক কাঠামোসহ সকল ক্ষেত্রেই তাদের মর্যাদা ছিল আলাদা। কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত ইতিহাস হলো ভয়াবহ নির্যাতন, ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অস্তিত্বের তাগিদে বন ধ্বংস, অপকল্পিত নগরায়ণ, দাবানলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মূলধারার জনগোষ্ঠীর আগ্রাসন, ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণে আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে বারবার। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। তাদের জীবন-জীবিকা-অস্তিত্ব এখন রীতিমতো হুমকিগ্রস্ত[১৪]।

শ্রমবিভাগ নারীকে মানুষ পরিচয় থেকে অনেক দূরে সরিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, সামাজিক ভিত্তি কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও নামিয়ে দিয়েছে অনেক অবহেলার স্তরে। আদিবাসী নারী আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত ও নিপীড়িত। সে নিপীড়িত প্রথমত, নারী হিসেবে, দ্বিতীয়ত, একজন আদিবাসী হিসেবে। সাঁওতাল নারীরা সমাজে পুরুষতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় শোষণ-বৈষম্য এবং পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের দ্বারা সমভাবে নিষ্পেষিত। তারা শেকড় থেকে উৎপাটিত।

এ পরিস্থিতিতে সাঁওতাল নারীরা আরো বেশি প্রান্তিক অবস্থানে উপনীত হয়। সামাজিক রূপান্তরের চরম মূল্যও শেষ পর্যন্ত আদিবাসী নারীকেই গুণতে হয়। এক সময় জুমচাষ, পশুপালনসহ উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীরা স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু ভূমির ওপর অধিকার হারানো এবং সমাজে শ্রমবিভাজন জটিল আকার ধারণ করায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আদিবাসী নারী। সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের প্রভাব থাকলেও পেশা পরিবর্তনে পারদর্শী না-হওয়ায় অধিকাংশ নারী হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন এবং গৃহবন্দি। সে কারণে দেখা যায়, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র আদিবাসী নারী। ভূমি ও অরণ্য থেকে উচ্ছেদের ফলে আদিবাসী নারী সামাজিক ভিত্তিমূল থেকেই উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। উৎপাদনের সনাতন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে তাদের বর্তমান মূল উৎপাদন কাঠামোতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের নির্ভরশীল আচরণ তৈরি হচ্ছে। সমাজ কাঠামোতে চিন্তার যৌথায়ন এবং পরিবার ও সমাজ পরিচালনায় ভূমিকা না-থাকায় পুরুষতন্ত্র দ্বারা নিগৃহীত হতে হচ্ছে। শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ সকল সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, যেকোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তারা নির্যাতনের অনিবার্য শিকার। সামাজিক আচারাদি ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক মাধ্যমেও তাদের মূল ভূমিকা উপস্থাপিত হয় না। সর্বোপরি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলপ্রবাহে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ না-থাকায় বিভিন্নভাবে তারা বঞ্চিত ও প্রতারিত[১৫]।

সার্বিকভাবে সমাজে সাঁওতাল নারী শ্রম ও উৎপাদনের অংশীদার হলেও ক্ষমতার অংশীদার হতে পারে নি। রাষ্ট্রীয় ভেদনীতি, দারিদ্র্যসহ বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি চেনা পুরুষতন্ত্র বিদ্ধ করেছে তাদের জীবন ও অস্তিত্ব। বেশিরভাগ আদিবাসী গোষ্ঠীতেই নারীর কোনো উত্তরাধিকার নেই। অনিশ্চিত উত্তরাধিকার নারীর বঞ্চনাকেই কেবল জিইয়ে রাখে না, এক ধরনের নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করে।

---

[13] Hembrom Dr T, The santals, 1996, Punthi pustak, 136/4B, Bidhansarani, Kolkata-700004, p-85-86

[14] Kochuchira, John, Political History of Santal Parganas: From 1765 to 1872, 2000, New Delhi, Inter-India, 2000. p5-9

[15] Rahman, Mizanur, 2005, "Bangladesh: Land Forest and Forest People", Society for Environment and Human Development (SEHD), Dhaka, Bangladesh.

৮.৫ মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্নকরণ

আমাদের দেশের জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত, আদিবাসী নারীর অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে, সাঁওতালদের তো আরো নেই। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় সংখ্যানুপাতে আসন ভাগাভাগির প্রথা প্রচলন রয়েছে। কিন্তু সেখানে আদিবাসী সাঁওতাল নারীর প্রতিনিধিত্ব করার কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয় নি।

বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সাঁওতাল নারীদের প্রতিনিধি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকা এখনো পর্যন্ত দুঃসাধ্যপ্রায়। আবার সংসদে সাঁওতাল নারী প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে আদৌ কোনো চিন্তা-ভাবনাও নেই। এ বাস্তবতা সাঁওতাল নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকারকে সীমিত করে দিচ্ছে।

৮.৬ ভূমির ওপর আগ্রাসন ও সাঁওতাল নারীর প্রান্তিকীকরণ

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত কায়েমি স্বার্থের পক্ষাবলম্বনকারী রাষ্ট্র নানা অজুহাতে বারবার লণ্ডভণ্ড করেছে সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা, তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। উন্নয়নের নামে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি, ইকোপার্ক নির্মাণ, অগ্রহণযোগ্য কয়লাখনি খননপ্রক্রিয়া, আর অধিপতি জনগোষ্ঠীর জমি দখলের দুর্দমনীয় লোভ ছিনিয়ে নিয়েছে সাঁওতালদের ভূমি, ভাষা, এমনকি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য। উচ্ছেদ হয়েছে হাজার হাজার সাঁওতাল পরিবার। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন, উচ্ছেদ আতঙ্ক— চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে আদিবাসী সাঁওতাল নারীর মানবাধিকার।

৮.৭ ঋণচক্র

পরিবারের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আদিবাসী নারীদের কাঁধেই চাপে। পুরুষ নানাভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের সামনে একমুঠো খাবার তুলে দেবার দায়িত্ব নারী আমৃত্যু পালন করে থাকে। কাজেই সংসারের অভাব-অভিযোগ, ঝক্কি-ঝামেলা নারীদেরই পোহাতে হয়। চরম বিপদের দিনেও তাকে পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। সাঁওতাল পরিবারগুলোতে সারাবছর অভাব থাকায় সংসারের অভাব মেটানোর জন্য তারা কখনো কখনো এনজিওর ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সাঁওতাল নারীদের অনেকেই বর্তমানে মহাজনি এবং এনজিওদের ঋণের জালে জর্জরিত। এনজিওগুলোর আদিবাসীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথক পলিসি নেই। এদিকে আদিবাসীরা গতানুগতিক ঋণ নিয়ে এই ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না-পারায় এই ঋণ তারা জীবনে কখনোই পুরোপুরি পরিশোধ করতে পারে না। বরং ক্রমবর্ধমান সুদের দুষ্টচক্রে তাদের জীবন বাঁধা পড়ে যায়। সৃষ্টি হয় স্থায়ী অশান্তি।

৯. উপসংহার

মূলত ক. কুসংস্কার, নিজেদের বুদ্ধিহীন মনে করা, খ. পুরুষের কর্তৃত্ব বা নারীর ওপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা, গ. অশিক্ষা, ঘ. অল্প বয়সে বিয়ে, ঙ. সম্পত্তির ওপর অধিকারহীনতা ইত্যাদি সাঁওতাল সমাজে নারীর উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। এজন্য তারা ক. পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষকে সমান চোখে দেখা, খ. শিক্ষার প্রসার গ. সামাজিক কাজ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমান অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে।

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

মূলধারার জনগোষ্ঠীর নারীর সঙ্গে সাঁওতাল নারীর তুলনা করলে অবস্থানের খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। তবে সাঁওতাল নারীরা কাজে-কর্মে, বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ও সংসার পরিচালনায় তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, মূলধারার অর্থাৎ বাঙালি নারীর তুলনায় সাঁওতাল নারীর অবস্থান বেশি খারাপ। কারণ তারা অধিক মাত্রায় অসচেতন, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, তাদের বাংলা ভাষার ওপর দখল কম। আইন-নীতি-প্রশাসন-মূলধারার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিসহ কোনো কিছুই তাদের অনুকূলে নয়। তাদের কোনো সংগঠন নেই। ফলে তারা প্রতিবাদও করতে পারে না।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় দারিদ্র্য, অসচেতনতা, প্রথাগত আইন, মেইনস্ট্রিম মানুষের আদিবাসীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি সাঁওতাল নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও একটা বড়ো সমস্যা।

এসব বাধা দূর করতে হলে তাদের সংগঠিত হওয়া বা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠন বা প্ল্যাটফরম গড়ে তোলা দরকার। পাশাপাশি মেইনস্ট্রিম নাগরিকদের সাঁওতালসহ আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। তাদের সমস্যাগুলোকে বোঝা, সে অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকদের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংবেদনশীল করে তোলা এ মুহূর্তে আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি শুধু সংবিধানে থাকলেই চলবে না, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলকে সোচ্চার হতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তার অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন দেশসমূহের আদিবাসীদের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ১৯৫৭ সালের ২৬ জুন স্বজাতীয় ও উপজাতীয় অদিবাসী কনভেনশন ১৯৫৭ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এই আইনটিতে অনুস্বাক্ষর করে। আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে এই কনভেশনটির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আজ অবধি এই কনভেনশনের সাথে সংগতি রেখে আদিবাসীদের রক্ষার জন্য কোনোরকম আইন আমাদের দেশে প্রণয়ন করা হয় নি। এ বিষয়ে আদিবাসীদের সাথে কোনোরকম আলোচনাও করা হয় নি। বরং নানা সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের সংজ্ঞা নিয়ে উদ্ভট মন্তব্য করা হয়। কখনো বলা হয়, এদেশে কোনো আদিবাসী নেই। আইএলও কনভেনশনের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত জমির ওপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।' অথচ বাংলাদেশ সরকার এই ঐতিহ্যগত ভূমিগুলোকে খাসজমি হিসেবে চিহ্নিত করে আদিবাসীদের উচ্ছেদের পাঁয়তারা করছে। এর মাধ্যমে শুধু আন্তর্জাতিক আইনেরই লঙ্ঘন হয় নি, বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিরও অপমান করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।' অথচ আদিবাসীরা রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল মানুষই (শৃঙ্খলহীন) স্বাধীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ করা উচিত।' এই কনভেনশনসমূহে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরের পরেও তা বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। অথচ এগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাঁওতাল নারীসহ আদিবাসীদের অস্তিত্ব, বৈচিত্র্যময় জীবন ও সমৃদ্ধি।

বাংলাদেশে বহু জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী নারীর বাস্তবতা ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা ও জনমত তৈরি করা দরকার। পাশাপাশি তাদের ন্যায়সংগত দাবিগুলোকে মূলধারার আন্দোলন-সংগ্রামে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের নারী সংগঠনগুলো এখনো শহর ও মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। সাঁওতালপ্রধান গ্রামগুলোতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের কোনো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা ছাড়া অন্য কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে দেখা যায় না। অথচ এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইস্যুগুলোতে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সাঁওতাল নারীদের সমস্যা সমাধানে দেশের মূলধারার নারী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের অধিকার আদায়ে শিক্ষিত-সচেতন করার পাশাপাশি আইনি সহায়তা দেওয়াও দরকার। আরো দরকার সাঁওতালদের যেসব প্রথাগত আইন বা নিয়ম রয়েছে সেগুলোর সংস্কার করা। সাঁওতালদের মানবাধিকার রক্ষায় প্রথাগত আইন বা নিয়মের কল্যাণকর অংশটুকু রেখে বাকিটুকু যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী নারীর সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের। আদিবাসী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে প্রণোদিত করার দায়িত্বটি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন ও নাগরিক সমাজ পালন করতে পারে।

চিররঞ্জন সরকার সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com